আঠারো নম্বর তোপখানা রোড

এরশাদ মজুমদার

এই শিরোনামে চট করে যে কেউ এই ঠিকানাটা চিনতে পারবেন না। এই বাড়িটার পূর্বে রাস্তা, তারপরেই বহু বিখ্যাত বাংলাদেশ সচিবালয়। যেখানে মন্ত্রী-সচিবরা বসেন। এই বাড়িটার পশ্চিমে চামেরী হাউস। এখন এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থা সিরডাপের অফিস। উত্তরে তোপখানা রোড। সে হিসেবেই বাড়িটার নম্বর আঠারো। দক্ষিণে সরকারী গাড়ি রাখার বড় একটি বাড়ি, তার পাশেই লাগোয়া ডেসার অফিস।

এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, এটা কোন বাড়ি এবং কি তার নাম? এটা হচ্ছে বিখ্যাত জাতীয় প্রেস ক্লাব। এক সময় এটা একটা লাল বাড়ি ছিল। তখন এর মালিক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বোস। লাল বাড়িটা বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা। ওই বাড়িটা ভেঙেই বর্তমানের বিশাল ভবনটি তৈরি করা হয়েছে।

ওই লাল ভবনটি নিয়ে ১৯৫৪ সালে আমাদের মুরুব্বীগণ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সরকারের গণসংযোগ পরিচালক মরহুম খায়রুল কবীর। প্রখ্যাত সিভিল সার্ভেন্ট এন এম খান ছিলেন তখন চীফ সেক্রেটারি। তিনিই মাসিক ১০০ টাকা ভাড়ায় লাল বাড়িটা নবগঠিত প্রেস ক্লাবকে দেন। ক্লাবের প্রথম কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মরহুম মুজীবুর রহমান খাঁ, মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব।

রচনার গ্রাহ্যতা বাড়াবার জন্যে জমি সংক্রান্ত কিছু তথ্যের আশায় গিয়েছিলাম ডিসি অফিসে। ডিসি আবদুল বারী কাল বিলম্ব না করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কারণ, রেকর্ড রুমে ক্লাবের জমির ব্যাপারে তেমন কোনও তথ্য নেই। এস এ দাগ ৬৪১ ও ১ নম্বর খতিয়ানে জমির পরিমাণ ৩ একর ৩৮ শতাংশ। পুরো জমিটা এখন প্রেস ক্লাবের দখলে নেই। জমিটা এখন পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। সব মিলিয়ে জমির পরিমাণ তিন একরের বেশি নয়। জমির পূর্বের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে, সঠিক উত্তর কারও কাছে পাওয়া যায়নি।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে এ এলাকায় মন্ত্রী ও সচিবদের বাড়ি নির্মাণ করা হয়। তখন থেকেই জমি ও বাড়ির মালিকানা সরকারের অধীনে চলে আসে। এর আগে

এসব জমি ছিল জমিদারদের নামে। কেউ বলেন ঢাকার নবাবদের নামে, আবার কেউ বলেন গাজীপুরের জমিদারদের নামে। এখন থেকে হাত দিলে প্রেস ক্লাবের একটা ইতিহাস তৈরি করা কঠিন হবে না। তবে আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কাজটা করতে আগ্রহী। এখন থেকে কাজটা শুরু করলাম। এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাহায্য কামনা করছি। ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও সহযোগিতা পাবো বলে আশা রাখি। এ ধরনের একটা বই লেখা অতি জরুরী বলে আমি মনে করি।

লাল ভবনটির ব্যাপারে ক্লাব সদস্যদের অনেকের আবেগ জড়িত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পুরনো বাড়িটা রেখেই নতুন একটা বাড়ি তৈরি করা যেতো। যেমন পশ্চিম দিকের চামেরী ভবন। যেখানে এখন সিরডাপের অফিস রয়েছে। পুরনো বাড়িটা রেখেই সেখানে নতুন অনেক বাড়ি উঠেছে।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান নিজে উদ্যোগ নিয়েই জমিটা বরাদ্দ করেন। একটু আগ্রহ থাকলে পুরো জমিটাই (৩.৩৮ একর) ক্লাব পেতো। তেমন আগ্রহ হয়তো ছিল না! জিয়াউর রহমানই নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরীণ সাজগোজ হালে অনেক বেড়েছে। আড্ডা দেয়ার জন্যে বিরাট একটা এসি লাউঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই লাউঞ্জে একটা বিরাট টিভিও আছে। যদিও এতে ভালো কিছু দেখার সুযোগ নেই। ডাইনিং রুমটাতেও এসি আছে। তবে রুমটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট। দুপুরবেলা খাবারের সময় খুবই ভিড় হয়। বেশ শব্দও হয়। বসার চেয়ারগুলো আরেকটু ভালো হলে সবাই খুশি হতো। তবে আরও ভালো হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা সাত শ'র একটু উপরে। ক্লাবে নিয়মিত আসেন প্রায় দু'শো সদস্য। এর বেশিরভাগই রিপোর্টার আর ফটো সাংবাদিক। ইদানিং রেডিও, টিভির বেশ কিছু নতুন সাংবাদিক সদস্যপদ লাভ করেছেন। পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে বলে ক্লাবের সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে।

ক্লাব প্রতিষ্ঠার লগ্নে যাঁরা সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন জীবিত নেই। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের বয়সও আশির কাছাকাছি। এদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত ক্লাবে আসেন তাঁরা হচ্ছেন এ বি এম মূসা, সবার মূসা ভাই। বয়স, অসুস্থতা কিছুরই ধার ধারেন না। নিয়মিত ক্লাবে আসেন, আড্ডা মারেন, পত্রিকায় কলাম লেখেন। তারপর নিয়মিত আসেন কে জি ভাই। হাসানউজ্জামান খান, আমাদের প্রিয় হাসান ভাই। তিনিও নিয়মিত ক্লাবে আসেন। ক'দিন আগে সন্তোষদা মারা গেলেন। তিনিও বেশ সিনিয়রদের একজন।

সবশেষে ফয়েজ ভাইয়ের কথা বলছি। ফয়েজ ভাই এখনও তরতাজা। আড্ডায় ওস্তাদ। ফয়েজ ভাই, মূসা ভাই আর মুকুল ভাইয়ের গল্প ও আড্ডার কথা পরে এক সময় লিখবো। বঙ্গবন্ধু নাকি এঁদের তিনজনকে ফজা, মোকলা, মুসা বলে ডাকতেন। এই তিনজন নাকি তাঁর

জন্যে আপদ বিপদ মুসিবত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মুকুল ভাই নাই।

'আঠারো নম্বর তোপখানা রোড' নামে একটি আড্ডা বিষয়ক বই লিখতে গেলে, আমি মনে করি সব জেনারেশনের সদস্যদের নানা মত এতে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আমার লক্ষ্য হচ্ছে, এটাকে একটা মূল্যবান গসিপ বা আড্ডার বই হিসেবে দাঁড় করানো।

সর্বশেষে রিয়াজ আর শওকতের কথা বলতে হয়। তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান। তাঁদের সময়েই ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে। এবার তাঁদের অনেক কিছু করার আছে। আশা করি, তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে এ কাজ সমাধা করতে পারবেন। স্থান ও সময়ের জন্যে লেখাটি মন মতো করতে পারিনি। আশা করছি, বইতে সব বিষয় আনতে পারবো।

লেখক দৈনিক ফসলের প্রধান সম্পাদক